স্থিতিস্থাপকতা, না-মানুষ ও অন্যান্য

আসিফ আদনান

অর্থনিতিতে ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা নামে একটা কনসেপ্ট আছে। কোনো জিনিসের দাম ওঠানামার সাথে সাথে সেটার চাহিদাও ওঠানামা করে। সহজ ভাষায়, দামের পরিবর্তনের কারণে কোনো কিছু দাম ওঠানামার মাত্রাকে প্রাইস ইলাস্টিসিটি (দামের স্থিতিস্থাপকতা) বলা হয়। সাধারণত, দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। দাম বাড়লে চাহিদা কমে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তবে কিছু পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ইনিলাস্টিক। দামের সাথে এদের চাহিদায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। ইনিলাস্টিক ডিমান্ডের একটা টেক্সটবুক উদাহরণ হলো হেরোইন। যে হেরোইনের নেশা করে, দাম বাড়লেও তার আগের মতো একই পরিমাণে হেরোইন লাগবে।

অ্যাডিক্ট হেরোইন কেনার সময় অর্থনৈতিক লাভক্ষতির হিসাব মেলায় না, সে হিসাব করে নেশা 'ধরার' জন্য মিনিমাম কতটুকু কিনতে হবে। একই কথা অন্যান্য আরও অনেক মাদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিকল্প কোনো পণ্য বাজারে আসার পরই কেবল মাদকের চাহিদায় পরিবর্তন আসে। যেমন : একসময় অ্যামেরিকায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ড্রাগের একটি ছিল কোকেইন। সবচেয়ে অ্যাডিক্টিভ মাদকের একটা হবার পাশাপাশি ফ্রি-বেইস কোকেইন সবচেয়ে দামি মাদকগুলোরও অন্যতম। তাই কিছুদিন পর কম দামের ক্র্যাক-কোকেইন সহজলভ্য হলে কোকেইন ব্যবহারকারীদের বিশাল একটা অংশ ফ্রি বেইস কোকেইন ছেড়ে ঝুঁকে ক্র্যাকে। নব্বইয়ের দশকে বাজারে এল অনেক কম দামের, আরও বেশি শক্তিশালী (ও বিপজ্জনক) ক্রিস্টালমেথ (মেথঅ্যাম্ফেটামিন)। অ্যাডিক্টদের অধিকাংশই এবার কোকেইন আর ক্র্যাক ছেড়ে মেথ ধরল, পাশাপাশি তৈরি হলো আরও অনেক নতুন অ্যাডিক্ট। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে একটা মাদকের চাহিদা কমলেও প্রায় সমান পরিমাণে বাড়বে সমগোত্রীয় বিকল্প কোনো মাদকের চাহিদা। আবার কমদামি বিকল্প মাদক সহজলভ্য হলে বেড়ে যাবে মাদক ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

ইনিলাস্টিক ডিমান্ড এবং 'নিবেদিতপ্রাণ' কাস্টমারদের কারণে মাদকের বাজারটা অন্যসব পণ্যের বাজারের চেয়ে আলাদা। যদি অন্যসব ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত থাকে (সেটেরিস পেরিবাস), তাহলে সময়ের সাথে সাথে একটা দেশে মাদকের ব্যবহার বাড়বে। খুব দূরে যাবার দরকার নেই, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ইয়াবার বাজারের দিকে লক্ষ করলেই প্রমাণ মিলবে। আর এমন হবে না-ই বা কেন? উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সন্তানরা ড্রাগ ব্যবহার করবে না কেন? যদি সবার ওপর মানুষ সত্য হয়, জীবনের উদ্দেশ্য হয় যত বেশি সম্ভব আনন্দ বা ইউটিলিটি খোঁজা, অপরাধের সংজ্ঞা যদি হয় কেবল আরেকজনের ক্ষতি করা, যদি ভালোমন্দ নির্ভর করে মানুষের ওপর–তাহলে নিজে নিজে মাদক ব্যবহার করলে সমস্যা কোথায়? অন্য কারও তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। রাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া অপরাধের সংজ্ঞা কি একজন 'মুক্তচিন্তার' মানুষ মেনে চলতে বাধ্য? দিকনির্দেশনা, নৈতিকতা, আত্মপরিচয় এবং উদ্দেশ্যহীন, পপ কালচারে মন্ত্রমুগ্ধ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদে দীক্ষিত, বন্ধু-আড্ডা-গানে হারিয়ে যাওয়ার মন্ত্রজপা যুবসমাজ কেন নেশা করবে না? কেন সাময়িক কিন্তু তীব্র আনন্দের স্বাদ নেবে না? চেতনা, দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্বের বুলি শুনতে ভালো, কিন্তু ওগুলোতে ডোপামিনের বন্যা নামে না, রক্তে নাচন ধরে না, তীব্র সুখের আগুন ধরে না শিরায় শিরায়।

কজন পারে নগদ সুখ পায়ে ঠেলতে? আর কতবার?

যদি মৌলিক ও ব্যাপক কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে ড্রাগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বেই। এটাই বাস্তবতা; আমার-আপনার খারাপ লাগায় বদলাবে না।

তাহলে ড্রাগ সমস্যার সমাধান কী?

আমাদের দেশে প্রায়ই মাদকবিরোধী অভিযান হয়। লিস্ট করে মারা হয় মানুষ কিংবা মাদক ব্যবসায়ী। মাঝেমধ্যে দুটো মিলেমিশে যায়। গুলিয়ে যায় সংজ্ঞা। গুলি চলে, নাম কাটা পড়ে। এ ধরনের অভিযানগুলোকে সমর্থন করেন অনেকেই। তাদের কাছে এটাই মাদক মহামারির সমাধান। আবার অনেকে ঠিক ভরসা পান না, কারণ অভিযানে মারা পড়ে কেবল চুনোপুঁটিরা, রাঘববোয়ালরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে থাকে বাংলার এস্কোবাররা। আপাতভাবে শুনতে বিপরীতমুখী মনে হলেও দুদলের বক্তব্য মৌলিকভাবে এক–'যদি মূল ব্যবসায়ীদের মেরে ফেলা হয়, তাহলে মাদক সমস্যার সমাধান হবে'।

ধরুন রাষ্ট্র রাঘববোয়ালের মেরে ফেলা শুরু করল, সত্যিকারভাবেই যুদ্ধ হলো মাদকের বিরুদ্ধে। তাহলে কি সমাধান আসবে?

আমাদের সমাজের অনেকের কাছেই এ ধরনের সমাধান আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু এভাবে সমাধান আসবে না। একজন এস্কোবারকে মারলে তার জায়গা নেবে দুজন কিংবা দশজন। এ ব্যবসায় খুব, খু-উ-ব বেশি লাভ। পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা তিনটি–মানুষ, মাদক, অস্ত্র। আর তিনটার মধ্যে সবচেয়ে সস্তা হলো মানুষ। তাই এক-দুই শ কিংবা এক-দুই হাজার মেরে এ বাজার বন্ধ করতে পারবেন না। কিছু লাশ ফেলে আমরা হয়তো আত্মতৃপ্তি পেতে পারি, কিন্তু যতদিন চাহিদা থাকছে, এস্কোবাররা আসবে যাবে। আর চুনোপুঁটিদের তো গোনায় ধরেও লাভ নেই। ব্যাপারটা অনেকটা মারিও পুজোর বিখ্যাত *গডফাদারের* গল্পের মতো। হেরোইন ব্যবসা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল গডফাদার ভিটো কর্লিওনি। এ জন্য মরতেও বসেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ ব্যবসায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল কর্লিওনিরা। ভিটো বুঝতে পেরেছিল তাকে ছাড়াও এ ব্যবসা চলবে, তার সিদ্ধান্তে কিছুই বদলাবে না। কেবল মাঝখান দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সে ও তার পরিবার। এমন হাই স্টেইক্সের খেলায় নীতি নিয়ে বিলাসিতার সুযোগ কোথায়?

ক্যাপিটালিযম–শীতল, হিসেবি, চতুর ক্যাপিটালিযম। খেলোয়ার আসবে যাবে, কিন্তু খেলা চলবে।

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখুন–ভর্তুকি দিয়ে চলা, চরম অদক্ষ, অকর্মণ্য সব কর্মচারী দিয়ে ভরা, নানা সমস্যায় জর্জরিত, মারাত্মক লসের মধ্যে থাকা রাষ্ট্র নামক কর্পোরেশান কীভাবে মোকাবেলা করবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী, টেক স্যাভি, ইনোভেটিভ, ক্রমাগত এক্সপ্যানশান, ইম্প্রুভমেন্ট এবং চরম পর্যায়ের প্রফিটে থাকা ইন্ডাস্ট্রিগুলোর একটির সাথে? অল্প কদিন না হয় লিস্ট-লিস্ট খেলা যাবে, তারপর? হয় তারা রাষ্ট্রকে আউটগান করবে, অথবা কিনে নেবে। মেক্সিকো কিংবা কলোম্বিয়ার দিকে তাকান। এ দেশগুলোর অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামো একরকম নিজেদের বানিয়ে নিয়েছে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সরকারি বাহিনী–কিনে নিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সব অংশের লোকজনকে। আমাদের ইয়াবার উৎস মায়ানমারেও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত খোদ সামরিক বাহিনী। আর এটা তো জানা কথা যে এমনিতেও বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির সত্যিকারের প্লেয়ারদের কখনো ছুঁতে পারবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের বিরুদ্ধে মোট সাত বছর ধরে দুটো যুদ্ধ করেছিল ব্রিটেন। আফিম ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ভারতের (বিশেষভাবে বঙ্গের) কৃষকদের সাদা মানুষেরা পপি চাষে বাধ্য করত আর তারপর সেটা বিক্রি করত চীনে। এ ব্যবসায় যুক্ত ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এবং অ্যামেরিকাও। এ সময়টাতে পশ্চিমে ঘটা ইকোনমিক বুমের পেছনে বিশাল একটা ভূমিকা ছিল আফিম ব্যবসার। বিংশ আর একবিংশ শতাব্দীর গল্পগুলো খুব একটা আলাদা না। এলএসডির ব্যাপক প্রচলন, এলএসডিসহ অন্যান্য ড্রাগ ব্যবহার করে বিভিন্ন সাইকোলজিকাল এক্সপেরিমেন্ট, বিটনিক ও হিপিদের ড্রাগ কালচার, ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে চলা মাদক উৎপাদনে (বিশেষত হেরোইন ও কোকেইন) সিআইএ-এর ভূমিকা নিয়েও অনেক লেখালেখি হয়েছে।[1] আমরা এমন একটা গ্লোবাল সিস্টেমের মধ্যে থাকি, যেই সিস্টেমই বৈশ্বিক ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই সিস্টেম চায় স্বল্পমেয়াদে ড্রাগের ব্যবহার একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখতে, আর দীর্ঘমেয়াদে বাড়াতে। এই সিস্টেম মূল প্লেয়ারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখে অথবা বলা যায় মূল প্লেয়ারদের অনেকেই সিস্টেমের ওপরের তলার অংশ। তাই সিস্টেমের ভেতরে থেকে, লিস্ট করে কিছু মানুষ কিংবা গডফাদার মারলে যে এই গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে, অথবা বাংলাদেশের মতো 'সম্ভাবনাময়' মার্কেট থেকে এই 'প্রডাক্ট' দূরে রাখা যাবে, এমন মনে করাটা সুখকর হলেও বাস্তবসম্মত না।

এ ছাড়া এ ধরনের ট্রিগার-হ্যাপি সমাধানের ব্যাপারে আরও কঠিন কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। যদি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকে ঢালাওভাবে

পলিসি হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে সেটার শেষ কোথায়? এ ধরনের 'সমাধানে' বেশ বড় ধরণের সমস্যা আছে। ধরুন নিয়ম করে সব মাদক ব্যবসায়ী এবং ব্যবহারকারীকে মারা শুরু হলো। এখন এটা কোথায় গিয়ে থামবে? একজন মাদক ব্যবহারকারী কিংবা একজন রোহিঙ্গা মাদকবিক্রেতা কি একজন চোর কিংবা ডাকাতের চেয়ে বেশি অপরাধী? কিংবা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা ঋণখেলাপির চেয়ে? সরকারি অফিসে বসে থাকা ঘুষখোরের চেয়ে? কিংবা চাঁদাবাজ? ধর্ষক? লিস্টে অ্যাটলিস্ট ধর্ষকদের মনে হয় রাখা উচিত। নিশ্চয় ধর্ষকদেরও এভাবে লিস্ট করে মেরে ফেলা যায়। আচ্ছা, শিবির-সন্ত্রাসী-জঙ্গি-মাদক ব্যবসায়ী-ধর্ষকদের সাথে ঋণখেলাপিদেরও কি অ্যাটলিস্ট লিস্টে রাখা যায়? একজন মাদক ব্যবহারকারী কিংবা মাদকের খুচরো ব্যবসায়ী কি একজন ঋণখেলাপির চেয়ে বড় অপরাধী? অপরাধের তীব্রতার মাত্রা কীভাবে ঠিক করা হবে? আচ্ছা এভাবে কি কখনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মেরে ফেলার সম্ভাবনা আছে? অথবা যেকোনো বিরোধিতাকারীকে? কোটাবিরোধী আন্দোলন কিংবা শিক্ষাখাতে ভ্যাটবিরোধীদের মেরে ফেলা কি এভাবে জায়েজ হতে পারে? কাদের কাদের এভাবে নিশ্চিন্ত মনে বিচার ছাড়া মেরে ফেলা যাবে সেটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক হবে?

জনমত? ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছে? সুশীল সমাজের মত?

মধ্যবিত্তের ভোট?

মানুষের বানানো সংবিধান?

নাকি জঙ্গলের নিয়মে?

চিন্তা করার ক্ষমতা একেবারেই যারা বিসর্জন দেননি তাদের বুঝতে পারার কথা যে, এ ধরনের প্রেসক্রিপশানে কোনো সমাধান আসবে না; বরং তৈরি হবে আরও বড় সমস্যা।

মাদক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য আরেকটা জনপ্রিয় সমাধান হলো মাদকবিরোধী আইন জোরদার করা, শাস্তি কঠিন করা এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আপাতভাবে এটাকে বেশ লজিকাল সমাধান মনে হয়। তবে ৭৬-এ অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া মিল্টন ফ্রিডম্যান এ ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। তার বিখ্যাত (কুখ্যাত) বক্তব্য ছিল, নেশাদ্রব্যগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রেখে মাদক সমস্যার সমাধান হবে না। অ্যামেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণের পলিসির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৯১৯ সালে অ্যামেরিকায় মদ উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রি ও পান করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এটার ফলাফল কী ছিল? মদ্যপানের পরিমাণ কমেনি, কিন্তু বেড়েছিল মদ্যপানের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা। বৈধ মদের অবর্তমানে মানুষ তখন ঝুঁকেছিল বিভিন্ন ধরনের চোলাই মদের দিকে। ঘরে মদ বানানো শুরু করেছিল অনেকেই। গড়ে উঠেছিল মদের বিশাল একটা ব্ল্যাকমার্কেট, এবং সেই বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য ব্যাপক খুনোখুনি শুরু করে দিয়েছিল মাফিয়াগুলো। আগে যে আইন মেনে চলা সুনাগরিক ছিল, শুধু মদ পান করার কারণে সে এখন অপরাধী হয়ে গেল।

সবগুলো কথা মাদকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তাই ফ্রিডম্যানের মতে সমাধান হলো, সব ড্রাগ বৈধ করে দেয়া। বৈধ করে দেয়া হলে মাদক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত অপরাধগুলো–যেমন : চুরি, ছিনতাই, খুন, ব্যবসায়ীদের নিজেদের ভেতরকার যুদ্ধ–কমিয়ে আনা যাবে–যেহেতু মাদকগুলো অবৈধ করে রাখার কারণে ড্রাগ ব্যবহারকারীরা অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। যদিও এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের সাধারণত অন্যান্য সব আইন মেনে চলা সুনাগরিক বলা চলে। আবার ব্যাপক চাহিদা থাকায় মাদকগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রাখার অর্থ হলো ড্রাগের ব্ল্যাকমার্কেট তৈরি করা এবং টিকিয়ে রাখা। যার কারণে মাদকগুলোর দাম বেড়ে যাচ্ছে। বেশি দাম দিয়ে ড্রাগ কিনতে গিয়ে বাড়ছে অপরাধ। নিম্নমানের প্রডাক্টের কারণে বাড়ছে ড্রাগ-রিলেটেড মৃত্যুও। এবং এতকিছুর পরও মাদকের ব্যবহার কমছে না; বরং দিন দিন বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। সবচেয়ে অ্যাডিক্টিভ মাদক হলো সিগারেট, যে মাদকের কারণে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় সেটা হলো অ্যালকোহল, অথচ এ দুটোই বৈধ। তাহলে অন্যান্য ড্রাগগুলো অবৈধ করে রাখার ক্ষেত্রে যুক্তি কী, আর কেন সেই যুক্তিগুলো

সিগারেট বা মদের ক্ষেত্রে খাটবে না?

বাস্তবতা হলো, চাহিদা এবং জোগান চালু থাকলে মাদকগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রেখে মাদকের ব্যবহার এবং মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ কোনোটাই কমানো যাবে না।

ইনফ্যাক্ট ড. ফ্রিডম্যানের দাবি হলো, মাদক বৈধ করে দিলে অ্যামেরিকাতে জেল এবং কয়েদির সংখ্যা কমবে। প্রতিবছর কমবে কমপক্ষে ১০ হাজার খুন। কমে আসবে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে অপরাধের মাত্রা, পরিমাণ ইত্যাদি।[2]

মজার ব্যাপারটা হলো, সহজাতভাবে প্রায় ৯০% বা তারচেয়েও বেশি মানুষের কাছে ড. ফ্রিডম্যানের কথা ভুল মনে হলেও লিবারেল সেক্যুলারিযমের অবস্থান থেকে ঢালাওভাবে তার কথাকে উড়িয়ে দেয়া বেশ কঠিন। ড. ফ্রিডম্যান নিজ বক্তব্যের পক্ষে বেশ কিছু শক্ত ডেইটা এনেছেন এবং আংশিকভাবে হলেও পশ্চিমে এ অবস্থান মেনে নেয়া শুরু হয়েছে। অ্যামেরিকার অনেক রাজ্যে এখন মারিওয়ানা (ক্যানাবিস, গাঁজা) বৈধ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্ক্যান্ডেনেইভিয়ার কিছু দেশে, বিশেষ করে নরওয়েতে নেশাজাতীয় ড্রাগগুলোকে ডিক্রিমিনালাইয (লিগালাইয না) করা হয়েছে। কাজেই, আপাতভাবে আমাদের কাছে যে সমাধানকে মানবিক এবং লজিকাল মনে হয় (শক্ত আইন, কঠিন শাস্তি) সেটাও আসলে অতটা সোজাসাপ্টা এবং কার্যকর না।

তাহলে সমাধান কী? এভাবেই কি আমাদের ড্রাগ ও ড্রাগমানির ক্রমবৃদ্ধিমান ব্যবহার ও প্রভাব দেখতে হবে?

সমাধান আছে, তবে সম্ভবত আপনার পছন্দ হবে না।

প্যারাসিটামলের সমাধান না, অপারেশনের সমাধান।

২০০০ এর মাঝামাঝি তালিবান নেতা মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার ঘোষণা করেন আফগানিস্তানে আর কোনো পপি চাষ হবে না। পৃথিবীর মোট পপির প্রায় ৯০% এবং হেরোইনের প্রায় ৭০% আসে আফগানিস্তান থেকে। তাই এ ধরনের ঘোষণার প্রতিফলন বাস্তবে কতটুকু ঘটবে এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল শুরু থেকেই। বিশেষ করে ত্রিশের দশকে অ্যামেরিকার মদ নিষিদ্ধ করার পলিসির ব্যর্থতার উদাহরণ বিশ্বের সামনে থাকার কারণে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ১ বছরের মাথায় তালিবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পপি চাষ ৯৯% কমে এল। কীভাবে তালিবান এই 'অসাধ্য' সাধন করল?

তালিবানের মাদকবিরোধী অভিযানের মোটাদাগে চারটি মূলনীতি পাওয়া যায় :

১) মাদক এবং মাদক উৎপাদনের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ব্যাপকভাবে প্রচার করা; জনমত তৈরি,

২) শরীয়াহ অনুযায়ী অপরাধীর দ্রুত ও কঠোর শাস্তির হুমকি,

৩) তৃণমূল পর্যায়ে মনিটরিং এবং পপি খেত ধ্বংস করা, ব্যর্থতার জন্য চাষিদের পাশপাশি তৃণমূলের দায়িত্বশীলদের শাস্তির ব্যবস্থা করা,

৪) অপরাধীদের পাবলিকলি শাস্তি দেয়া ও অপমানিত করা।[3]

আইনশৃঙ্খলা বা অপরাধ পরিস্থিতির বদলে তালিবান পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রোচ করল শরীয়াহর হুকুম বাস্তবায়ন হিসেবে। আধুনিক, সভ্য, সফিসটিকেইটেড অ্যামেরিকান রাষ্ট্রযন্ত্র যেখানে ব্যর্থ, 'বর্বর, মধ্যযুগীয়, আনকালচারড' জঙ্গি তালিবান সেখানে সফল হলো। কান্দাহার আর হেলমান্দের কৃষকরা বলা শুরু করল, না খেয়ে মারা গেলেও তারা আর কখনো পপি চাষ করবে না। অপরাধের সাথে যুক্ত বিশাল একটা অংশকে তারা অপরাধ ছেড়ে দিতে কনভিন্স করা গেল। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিংবা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে না, এটা করা হল আল্লাহর সার্বভৌম আইনের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে।

‘আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর কেবল আমাদেরই অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার আছে, তাই আমরা যা বলব তা-ই আইন’, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের এ মেসেজের বদলে বলা হল—‘আসমান ও যমিনের মালিক এ কাজ হারাম করেছেন, আর আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইনই চলবে। যে আল্লাহর আইন মানবে না সে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। আর দুনিয়াতে, আমরা শরীয়াহ অনুযায়ী তাদের বিচার করব। এর চেয়ে বিন্দুমাত্র কম বা বেশি করার এখতিয়ার আমাদের নেই।’

তালিবান মানুষের সামনে এমন একটি আদর্শ দিলো যা তাদের ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করল। বাস্তবতা বলে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, মুক্তচিন্তা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তালিবান এমন একটি বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসন গড়ে তুলল যেখানে আসলেই বিচার হয়, অপরাধী যে-ই হোক না কেন। সেক্যুলার সিস্টেমের মতো না, যেখানে বিচার হয় কেবল দুর্বলদের। এবং তারা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলল যা পশ্চিমের গড়ে তোলা গ্লোবাল সিস্টেমের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, আর তাই গ্লোবাল ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির মূল প্লেয়ারদের তোয়াজ করাকেও দরকার মনে করে না। ভালো ও মন্দের মানবরচিত পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার বদলে তারা নিজেদের কাজগুলোকে সাজাল পরম, ধ্রুব সংজ্ঞার কাঠামোতে। অপরাধীও স্বীকার করল সে যা করছে তা আসলেই অপরাধ। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতাসীনদের দেয়া সংজ্ঞা, মানবরচিত আইন কিংবা নির্বাচনী হিসেব-নিকেশের কারণে না, তারা স্বীকার করল কারণ সৃষ্টিজগতের মালিক বলেছেন এটা অপরাধ।

আধুনিক ইতিহাসে এর চেয়ে সফল আর কোনো মাদকবিরোধী অভিযানের দৃষ্টান্ত নেই।

এটা কি তালিবানের কৃতিত্ব? না, এটা আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নাযিলকৃত শরীয়াহর সৌন্দর্য। পশ্চিমা সেক্যুলার মানবরচিত আইনের বদলে তালিবান আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল, তাঁদের কৃতিত্ব এটুকুই।

২০০১ সালে অ্যামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পর আফিম উৎপাদন আবার আগের অবস্থায় ফেরত যায়। ২০১৭ সালে উৎপাদিত হয় আফগান ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ হেরোইন।

প্রাচীন রোমে এক শ্রেণির মানুষকে বলা হত হোমো সাসের (Homo Sacer), এরা না-মানুষ। নিষিদ্ধ। যে কেউ এদের মেরে ফেলতে পারে। মানবতার বুলি আওরাতে আওড়াতে, সভ্যতার সবক দিতে দিতে আমরাও তৈরি করে নিয়েছি আমাদের হোমো সাসের। পশ্চিমের কাছে, সাম্রাজ্যের কাছে হোমো সাসের হলো জঙ্গি, সন্ত্রাসী। জঙ্গি হলে গর্ভের শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ এবং এ দুয়ের মাঝে বাকি সবাই হত্যাযোগ্য। ২ কোটি মানুষ জাস্ট সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কোলেটরাল ড্যামেজ।[4] কারও ওপর একবার জঙ্গি নামটা লাগিয়ে দিতে পারলেই হলো, আর কিছুর দরকার নেই। জঙ্গি ট্যাগ লাগানো গেলে যারা জঙ্গিত্ব থেকে বাঁচতে বেপরোয়া, সাম্রাজ্যবাদের কুনজর এড়াতে, স্বীকৃতি পেতে আর ‘শত্রু’ হওয়া এড়াতে নতজানু, সেই ‘মূলধারাকেও’ পাইকারিভাবে মেরে ফেলা যায় রাতের অন্ধকারে। সকালের পত্রিকায় গাছ কাটা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেই হয়ে যায়। ফিরিঙ্গি হতে চেয়েও হতে না পারা আমাদের কাছে না-মানুষ হলো এমন যে কেউ যার সাথে আমরা নিজেদের মেলাতে পারি না, অথবা চাই না। এদের পরিবার নেই, অধিকার নেই, এদের নিয়ে কথা বলার কিছু নেই, অর্থ নেই এদের পেছনে দামি আবেগ খরচ করার। এদের স্ত্রী নেই, বাচ্চা নেই, পরিবার নেই, এদের নিয়ে হা-হুতাশ, আদিখ্যেতা আর পাবলিক রিলেশনের মাস্টারপিস তৈরি করার কেউ নেই। এদের জীবনের দাম নেই। এদের মৃত্যুকে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মানবিক বানানোর জন্য নেই অডিও কিংবা ভিডিও, নেই প্রতিবাদ কিংবা প্রতিবাদ করে সেলিব্রিটিদের সভ্য হবার আর দুঃখপ্রকাশ করে নিজের মনুষ্যত্ব প্রমাণের সুযোগ। এদের মৃত্যুর পর অপরাধ ও শাস্তি, বিচার ও ইনসাফ নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনায় মগ্ন হয়ে নিজেকে গোপনে বাহবা দেয়া যায় না। ফেইসবুকে ‘রেস্ট ইন পিস’, ‘ওপারে ভালো থাকিস’ জাতীয় স্ট্যাটাস দেয়া যায় না। চিন্তা করা যায় না মোমবাতি কিংবা ফানুশ জ্বেলে হাত ধরাধরি করে শোক পালনের আদিখ্যেতার কথা। এদের নিয়ে চিন্তা, কথা, আবেগ, দুঃখ কিংবা প্রশ্ন বৃথা; অলাভজনক। এরা না-মানুষ, প্রায় অস্তিত্বহীন। পত্রিকার শেষ পাতায় কিংবা ভেতরে দু-তিন ইঞ্চির কলাম, চিন্তার ফুটনোট, আড্ডায় কিছু একটা বলে নিজের উপস্থিতি কিংবা চিন্তার অস্তিত্ব জানান দেয়ার রসদ। যতক্ষণ আমার জীবনে ব্যাঘাত ঘটছে না, ততক্ষণ যাকে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে মেরে ফেলা হোক। আমার আপত্তি নেই।

ইচ্ছেমতো মানুষকে হত্যাযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার মতো এত ভয়ংকর পর্যায়ের যুলুমও আমরা মেনে নেব, কিন্তু সমাধানের দিকে তাকাব না। আমাদের মধ্যে কেউ সুষ্ঠু ও অবাধ গণতন্ত্রের কথা বলবে, কেউ মানবাধিকারের মুখস্থ বুলি আওড়াবে, কেউ বলবে দেশপ্রেম, চেতনা, মুক্তচিন্তা আর বাক্স্বাধীনতার কথা; কেউ পোস্ট-মর্ডানিস্ট ব্যাখ্যা দেবে, রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ আর সমাজের অভিজাতদের শক্তি উপাসনার আলোকে 'বাবা তুমি কানতেসো যে' কথাটাকে ডিনকন্সট্রাক্ট করবে, কেউ বলবে পশ্চিম কত ভালো, কেউ বলবে বিএনপি কত ভালো, কেউ 'আই হেইট পলিটিক্স' কপচাবে; কেউ ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলবে নৌকায় কিংবা দুই নৌকায় পা দিয়ে; কেউ স্বপ্ন দেখবে ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রভাব অর্জনের বালুর প্রাসাদের, মগজে পশ্চিম আর অন্তরের অর্ধেকটাতে ইসলাম রেখে কেউ কেউ প্রলাপ বকে যাবে, নিজের কাপুরুষতার ওপর প্রলেপ দেবে সংবেদনশীলতা, হিকমাহ আর বুদ্ধিবৃত্তির; আর কেউ কেউ বলবে 'শালার জাতটাই খারাপ'–কিন্তু কেউ সমাধানের কথা বলবে না। পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়াহর কথা কেউ বলবে না, সাম্রাজ্যের মোকাবেলার কথা কেউ বলবে না। সমাধানের প্রয়োজনীয় দাম দিতে কেউ রাজি না ।

ঘ্যানঘ্যানে কিছু বুড়ো মানুষ থাকেন। প্রায় সারা বছর ইনারা অনুযোগ করবেন কোনো না কোনো অসুখ নিয়ে। প্রতিবার কথা বলার সময় কত কষ্টে আছেন, শরীরের কত জায়গায় সমস্যা–সেটার লম্বা ফিরিস্তি দেবেন। কিন্তু পিছিয়ে যাবেন আগাগোড়া চেকআপ, বড় কোনো সমস্যা থাকলে প্রয়োজনীয় অপারেশন বা অন্য কোনো চিকিৎসার কথা বললে। সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করতে প্রায় অসীম আগ্রহ থাকলেও তারা সমাধানে আগ্রহী না। আসলে বলা উচিত, সহজ সমাধান না থাকলে কঠিন সমাধানের বদলে সমস্যা নিয়েই বেঁচে থাকাই তাদের পছন্দ। আমার কেন জানি মনে হয়, আমাদের অবস্থা এই ঘ্যানঘ্যানে বুড়োদের মতো। সেই ছোটকাল দেখে আসছি সমস্যা। সমস্যার আর শেষ নেই। সবাই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চায়। সবার কোনো না কোনো মতামত আছে। সবাই বিশেষজ্ঞ, সবাই ইমোশনালি ইনভেস্টেড। কিন্তু ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করার বদলে, মূল সমস্যা নিয়ে কথা বলতে বলুন–তখন আর কাউকে পাবেন না। আমরা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হিসেবে প্যারাসিটামল চাই। ফাঁপা হয়ে যাওয়া হাড় সারাতে ব্যান্ডএইড লাগাই। ধর্ষণ বলুন কিংবা মাদক সমস্যা–এই সমস্যাগুলো সিস্টেমিক। যায়নিস্ট ব্যাংকার আর ক্রুসেইডার জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত যে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি এগুলো সেই ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা। এগুলো সুশাসনের সমস্যা না, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল কিংবা জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃতিগত সমস্যাও না। এগুলো সভ্যতার সমস্যা। লিবারেল সেক্যুলার সভ্যতার চূড়োয় থাকা দেশগুলোর দিকে তাকান–তারা কি ধর্ষণ, মাদক, মানবপাচার, শিশুকামের মতো সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পেরেছে? বরং যত 'সভ্য' হয়েছে তত বেড়েছে এ অপরাধগুলোর পরিমাণ, মাত্রা এবং অপরাধী কার্টেলদের কাজের সূক্ষ্মতা আর মুনশিয়ানা।

অন্যদিকে সভ্য আমরা যে সমস্যার সমাধান বের করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি, জলজ্যান্ত মানুষকে লিস্টে থাকা নাম বানিয়ে ফেলছি, যখন-তখন যাকে-তাকে না-মানুষ বানিয়ে হ্যাঁ-মানুষদের বানানো আইনে মেরে ফেলার লাইসেন্স দিচ্ছি, এবং এত সবকিছুর পরও ব্যর্থ হচ্ছি–১৪০০ বছর আগে মদীনাতে খুব সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। মদীনার উদাহরণ অনুসরণ করে, বেশি না মাত্র ১৮ বছর আগে আফগানিস্তানে এই সমস্যার সমাধান করে দেখিয়েছে আমাদের ভাষায় পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী। কিন্তু তবু আমরা চোখ বুজে থাকব, ওই সমাধানের দিকে তাকাব না। আমরা কখনো বাহবা দেবো, কখনো অডিও নিয়ে তোলপাড় করব, কখনো ভুলে যাব, চিন্তায় জাবর কাটব, কখনো বা 'কনসার্নড' হব। কিন্তু সমাধান করব না। সমাধানের দিকে তাকাব না। সমাধান নিয়ে চিন্তাও করব না। কেবল মৌসুমি অভিযোগ, অনুযোগ, ক্ষোভ আর নিন্দাজ্ঞাপনের দুঃখবিলাস করে যাব।

সমাধান আছে। সমাধানের বাস্তব দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু আমরা সমাধানে আগ্রহী না। আমরা আগ্রহী দুঃখবিলাস আর জাতে ওঠায়। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা ঘুরপাক খেতে থাকব রুটিন অনুযায়ী সমর্থন-নিন্দা-ক্ষোভ আর তারপর ভুলে যাওয়ার চক্রে।

আমাদের জন্য সমাধান একটাই, রোজ প্যারাসিটামল দুই বেলা।

* * *

[1] আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন *The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade*, Alfred

W. McCoy এবং The Search for the "Manchurian Candidate": The CIA and Mind Control: The Secret History of the Behavioral Sciences, Johon Marks।

[2] আরও জানতে দেখতে পারেন, ‘America’s Drug Forum, Interview with Milton Friedman (1991) - https://bit.ly/28T24qp, https://bit.ly/2sqgV42,

[3] দেখুন : Where have all the flowers gone?: Evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, Graham Farrell & John Thorne (2004).

[4] Direct War Death toll, Costs of War, https://bit.ly/2PcDV0w

Refugees & Health, Costs of War, https://bit.ly/2ItTsrn